#আমি পদ্মজা পর্ব ৩৯

_____

হেমলতার এহেন প্রশ্নে পূর্ণা চমকে উঠল। চাপা স্বরে অবাক হয়ে উচ্চারণ করল, 'আম্মা!'
সেকেন্ড কয়েক পর পূর্ণার উপর থেকে হেমলতা চোখ সরিয়ে নিলেন। পূর্ণা বলল,'আমাকে চিনতে পারছো না?'
হেমলতা বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন, 'ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। তাই এমন হয়েছে। সবার খাওয়াদাওয়া হয়েছে?'
পূর্ণা তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। হেমলতা পূর্ণার দিকে তাকান। জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে? কিছু জিজ্ঞাসা করেছি না?'
'হয়েছে। দুপুরের আযান পড়বে।'
'এতক্ষণ ঘুমিয়েছি! আরো আগে ডাকতে পারলি না?'

‘ঘুমাচ্ছিলে আরাম করে। তাই ডাকিনি।’
‘ফজরের নামাযটা পড়া হলো না। এখন কাযা পড়তে হবে। তুই নামায পড়েছিলি তো?’
‘পড়েছি।’
‘খেয়েছিস?’
‘না।’
‘এরকম করে আর কতদিন চলবে? যা খেয়ে নে।’

পূর্ণা বাধ্য মেয়ের মতো হেঁটে চলে গেল রান্নাঘরে। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। কতক্ষণ না খেয়ে রাগ করে থাকা যায়? হেমলতা খোলা চুল হাত খোঁপা করে নেন। এরপর কলপাড়ের দিকে যান। অযু করে ঘরে ঢোকার সময় দেখেন,পূর্ণা খাচ্ছে। তিনি পূর্ণার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘খাওয়া শেষ করে ঘরে আসিস।’

পূর্ণা খেয়েদেয়ে থালা ধুয়ে গুছিয়ে রাখে। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দেখে, চারা গাছ

লাগানোর জন্য বাসন্তী উঠানের এক কোণে বসে মাটি খুঁড়ছেন। পূর্ণা দৃষ্টি সরিয়ে হেমলতার ঘরে আসে। এসে দেখে হেমলতা জায়নামাজে অসম্ভব উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন। পূর্ণা ডাকল,' আম্মা?'

হেমলতা চমকে তাকান। পূর্ণা দ্বিতীয়বারের মতো অবাক হয়। চমকানোর কী এমন হলো? হেমলতা স্বাভাবিক হয়ে বসেন। জায়নামাজ ভাঁজ করেন ধীরেসুস্থে। এরপর পূর্ণাকে কাছে এসে বসতে বলেন। পূর্ণা পাশে এসে বসে। হেমলতা ভারী কণ্ঠে বললেন,'আপার(বাসন্তী) প্রতি তোর এতো রাগ কেন? আম্মাকে বল?'
'এখন রাগ নেই।'
'প্রেমা-প্রান্তের মতো মিলেমিশে থাকতে পারবি না? ওরা বড় আম্মা ডাকে। তুই শুধু খালাম্মা ডাকবি।'
'মাত্র উঠলে ঘুম থেকে। আগে খাও। এরপর

কথা বলব।’
‘আমি এখনই বলব। কথাগুলো বলব বলব করে বলা হয়নি। দেখ পূর্ণা, আপা অন্য পরিবেশে বড় হয়েছে,থেকেছে তাই একটু অন্যরকম। তাই বলে মানুষটা তো খারাপ না। আপা সত্যি একটা সংসার চায়। পরিবারের একজন সদস্য ভাবতে দোষ কোথায়? বাকি জীবনটা কাটাক না আমাদের সাথে। আমার কাজকর্মের একজন সঙ্গীও হলো। বয়স তো হচ্ছে,একা সব সামলানো যায়? আপারও বয়স হচ্ছে। কিন্তু দুজনে মিলে তো কাজ করতে পারব। কয়দিন পর তোর বিয়ে হবে,প্রেমার বিয়ে হবে। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি। তখন আমার একজন সঙ্গী থাকলো। আর এমন নয় যে,আপার মনে বিষ আছে। আপারও ভালো সঙ্গ দরকার। ভালো পরিবেশ, ভালো সংসার। আমি দেখেছি, আপা কত সুখে আছে এখানে।

প্রেমা-প্রান্তর জন্য জান দিয়ে দিতে প্রস্তুত। নিঃসন্তান বলেই হয়তো এমন। আপা কিন্তু এখন আমাদের ছাড়া অসহায়। উনার মা মারা গেছে। বাবা তো নেই। আত্মীয়-স্বজন নেই। এই বয়সে যাবে কই? আমরা একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারি না? সতিন হলেই সে খারাপ হবে,সৎ মা হলেই সে খারাপ হবে এমন কোনো বাণী আছে?'

পূর্ণা বেশ অনেকক্ষণ চুপ রইল। এরপর বলল,'কিন্তু উনি অনেক সাজগোজ করেন। যদিও আমাকে কিছুক্ষণ আগে বলেছেন,আর সাজবেন না। তবে,উনার কথার ধরণ আমার ভালো লাগে না। স কে ছ উচ্চারণ করেন। শুদ্ধ-অশুদ্ধ মিলিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়ে কথা বলেন।'

হেমলতা পূর্ণার কথায় হাসলেন। পূর্ণা ওড়নার আঁচল আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে এদিকওদিক

তাকাচ্ছে। হেমলতা পূর্ণার মাথায় হাত রাখেন। বললেন, ‘তোর আপা যদি প্রান্তকে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করিয়ে দিতে পারে। তুই তোর বাসন্তী খালাকে স উচ্চারণ শিখাতে পারবি না?’
‘উনি শিখবেন?’
‘বললে,অবশ্যই শিখবেন।
‘সত্যি?’
‘বলেই দেখ।’
‘এখন যাব?’
‘যা।’
‘যাচ্ছি।’
পূর্ণা ছুটে বেরিয়ে গেল। হেমলতা মৃদু হেসে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। সেলাই মেশিনের সামনে বসেন। অনেকগুলো কাপড় জমেছে। সব শেষ করতে হবে।

উঠানে বাসন্তীকে পেল না পূর্ণা। এদিকওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকল। বাসন্তী কলপাড় থেকে

হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা কথা বলতে গিয়ে দেখে জড়তা কাজ করছে। দুই তিনবার ঢোক গিলে ডাকল, ‘শুনুন?’
বাসন্তী দাঁড়ালেন। পূর্ণাকে দেখে হাসলেন। পূর্ণা এগিয়ে এসে বলল, ‘আপনাকে আমি পড়াব।’
‘কী পড়াইবা?’
‘লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় আসেন আগে।’

বাসন্তী কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। তবুও পূর্ণার পিছু পিছু গেলেন। বারান্দার চৌকির উপর পূর্ণা বসল। পূর্ণার সামনে বাসন্তী বসেন উৎসুক হয়ে। পূর্ণা গম্ভীর কণ্ঠে বলল,
‘আপনাকে দন্ত-স উচ্চারণ শেখাব আমি।’
‘দন্ত-ছ উচ্চারণ তো আমি পারি।’
‘আপনি দন্ত-স না বলে দন্ত-ছ বলেন। শুনতে ভালো লাগে না। বলুন, দন্ত-স।’
বাসন্তী থতমত খেয়ে যান। চোখ ছোট ছোট করে বললেন, ‘দন্ত-ছ।’

‘হয়নি। বলুন, দন্ত-স।’
‘দন্ত-ছ।’
‘আবারও হয়নি। আচ্ছা বলুন, সংসার।’
‘ছংছার।’
‘স-ং-সা-র।’
‘ছ...সওও-ং-চ..সার।’
সংসার উচ্চারণ করতে করতে পূর্ণার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েন বাসন্তী। পূর্ণা বলল,’উপরে চলে আসছেন কেন? দূরে বসুন।’
বাসন্তী দ্রুত সোজা হয়ে বসেন। পূর্ণা বলল,
‘এবার বলুন, সন্তান।’
‘স..সন্তান।’
‘ফাটাফাটি! হয়ে গেছে। এবার বলুন,আসছে।’
‘আছছে।’
‘আরে,আবার ছ উচ্চারণ করছেন কেন? বলুন, আসছে। আ-স-ছে।’
‘আ-স-ছে।’

‘হয়েছে। এবার বলুন, সাজগোজ।’
‘সাজগোছ।’

_____

হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা একসাথে বসেছে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। আলমগীর, খলিল সবাই আজ উপস্থিত আছে। আমির দুই দিন পর শহরে ফিরবে। তাই আলমগীর চলে এসেছে। অতিরিক্ত গরম পড়েছে। বাড়ির চারপাশে এতো গাছপালা তবুও একটু বাতাসের দেখা নেই। আমিনা,লতিফা বাতাস করছে। পদ্মজা,ফরিনা,রিনু খাবার বেড়ে দিচ্ছে। পদ্মজা আমিরের থালায় মাংস দিতেই আমির বলল, ‘তুমি কখন খাবে?’
পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। বলল, ‘আম্মার সাথে।’
‘এখন বসো না।’

‘জেদ ধরবেন না। অনুরোধ। ‘ ফিসফিসিয়ে বলল পদ্মজা।

এরপর মাছের তরকারি আনার জন্য রান্না ঘরে যায়। বাটিতে করে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে আসে। আমিরের দিকে চোখ পড়তেই আমির চোখ টিপল। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে হাসে। আলমগীরের থালায় মাছের ঝোল দেওয়ার সময় খেয়াল করল, আলমগীর বেশ ফুর্তিতে আছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হবে। এসে একবারও রুম্পার কথা জিজ্ঞাসা করল না। কী অদ্ভুত! বউয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া,ভালোবাসা নেই যে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

রানি,লাবণ্য ছুটে এসে বাপ-চাচার মাঝে বসে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সবাই বিভিন্ন রকম আলোচনা করছে। রানির বিয়ে নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে। খুব দ্রুত রানির বিয়ে দিতে চান তারা। আচমকা রানি গড়গড় করে বমি করতে আরম্ভ

করল। সবাই বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। প্রতিটি খাবারের থালা নষ্ট হয়ে যায়। আমিনা দ্রুত রানিকে ধরে কলপাড়ে নিয়ে যান। লাবণ্য,পদ্মজা,নূরজাহান, ফরিনা ছুটে যান পিছু পিছু। বাড়ির পুরুষেরা হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। মুহূর্তে একটা হইচই লেগে গেল।

রানি বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কলপাড়ে বসে পড়ে। আমিনা হায় হুতাশ করে বিলাপ করছেন, ‘আমার ছেড়িডার কী হইলো? কয়দিন ধইরা খালি বমি করতাছে। জ্বীনের আছড় লাগল নাকি। কতবার কইছি যহন তহন ঘর থাইকা বাইর না হইতে। ‘
লাবণ্য তথ্য দিল, ‘আপা রাতেও ছটফট করে। ঘুমাতে পারে না।’
আমিনা কেঁদে কূল পাচ্ছেন না। রানির চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। তিনি রানিকে প্রশ্ন করলেন, ‘আর কী কষ্ট হয় তোর? ও আম্মা

কবিরাজ ডাকেন। আমার ছেড়িডার কী হইলো।’
রানি ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘মাথাডা খালি চক্কর মারে।’
নূরজাহান চোখ দু’টি বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন, ‘এই ছেড়ি তোর শরীর খারাপ শেষ কবে হইছে?’
‘দুই মাস হবে।’ কথাটা বলে রানি চমকে উঠল। সবাই কী ধারণা করছে? সে চোখ তুলে উপরে তাকায়। সবাই উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে। রানির শরীর কাঁপতে থাকে। আমিনা মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘এমন কিছু হয় নাই আম্মা। আপনি ভুল বুঝতাছেন। আমার ছেড়ি এমন না।’
‘হেইডা কবিরাজ আইলে কওয়া যাইব। এই ছেড়ির জন্যে যদি এই বাড়ির কোনো অসম্মান

হয় কাইট্টা গাঙে ভাসায়া দিয়াম। মনে রাইখো বউ।’ নূরজাহান বললেন রাগী স্বরে। রানির গলা শুকিয়ে কাঠ! হৃৎপিণ্ড দ্রুত গতিতে চলছে। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। একসময় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল আমিনার কাঁধে। আমিনা চিৎকার করে উঠলেন, ‘ও রানি...’

চলবে..